গল্প

দর্পচূর্ণ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

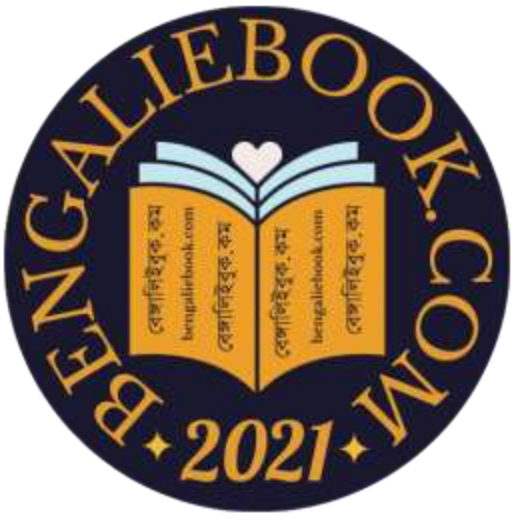

দর্পচূর্ণ

এক

সন্ধ্যার পর ইন্দুমতী বিশেষ একটু সাজসজ্জা করিয়া তাহার স্বামীর ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল, কি হচ্ছে?

নরেন্দ্র একখানি বাঙ্গালা মাসিকপত্র পড়িতেছিল; মুখ তুলিয়া নিঃশব্দে ক্ষণকাল স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া সেখানি হাতে তুলিয়া দিল।

ইন্দু খোলা পাতাটার উপর চোখ বুলাইয়া লইয়া, জোড়া ভ্রু ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিল—ইস, এ যে কবিতা দেখচি! তা বেশ—বসে না থাকি, বেগার খাটি। দেখি এখানা কি কাগজ? 'সরস্বতী'? 'স্বপ্রকাশ' ছাপালে না বুঝি?

নরেন্দ্রর শান্ত দৃষ্টি ব্যথায় ম্লান হইয়া আসিল।

ইন্দু পুনরায় প্রশ্ন করিল, 'স্বপ্রকাশ' ফিরিয়ে দিলে?

সেখানে পাঠাই নি।

পাঠিয়ে একবার দেখলে না কেন? 'স্বপ্রকাশ', 'সরস্বতী' নয়, তাদের কাণ্ডজ্ঞান আছে। এইজন্যেই আমি যা তা কাগজ কখ্খনো পড়িনে।

একটু হাসিয়া ইন্দু আবার কহিল, আচ্ছা, নিজের লেখা নিজেই খুব মন দিয়ে পড়। ভাল কথা,—আজ শনিবার, আমি ও-বাড়ির ঠাকুরঝিকে নিয়ে বায়স্কোপ দেখতে যাচ্চি। কমলা ঘুমিয়ে পড়েছে। কাব্যের ফাঁকে মেয়েটার দিকেও একটু নজর রেখো। চললুম!

নরেন্দ্র কাগজখানি বন্ধ করিয়া টেবিলের একধারে রাখিয়া দিয়া বলিল, যাও।

ইন্দু চলিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ একটা গভীর নিঃশ্বাস কানে যাইতেই সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আচ্ছা, আমি কিছু একটা করতে চাইলেই তুমি অমন করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল কেন, বল ত? এতই যদি তোমার দুঃখের জ্বালা, মুখ ফুটে বল না কেন, আমি বাবাকে চিঠি লিখে যা হোক একটা উপায় করি।

নরেন্দ্র মুহূর্তকাল মুখ তুলিয়া ইন্দুর দিকে চাহিয়া রহিল। মনে হইল যেন সে কিছু বলিবে। কিন্তু কিছুই বলিল না, নীরবে মুখ নত করিল।

নরেন্দ্রর মামাত ভগিনী বিমলা ইন্দুর সখী। ও-রাস্তার মোড়ের উপরেই তাহার বাড়ি। ইন্দু গাড়ি দাঁড় করাইয়া, ভিতরে প্রবেশ করিয়াই বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া কহিল, ও কি ঠাকুরঝি! কাপড় পরনি যে! খবর পাওনি নাকি?

বিমলা সলজ্জ হাসিমুখে বলিল, পেয়েচি বৈ কি, কিন্তু একটু দেরি হবে ভাই। উনি এইমাত্র একটুখানি বেড়াতে বেরুলেন—ফিরে না এলে ত যেতে পারব না।

ইন্দু মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইল। একটা খোঁচা দিয়া প্রশ্ন করিল, প্রভুর হুকুম পাওনি বুঝি ?

বিমলার সুন্দর মুখখানি স্নিগ্ধ মধুর হাসিতে ভরিয়া গেল। এই খোঁচাটুকু সে যেন ভারি উপভোগ করিল। কহিল, না, দাসীর আর্জি এখনও পেশ করা হয়নি, হলে যে না-মঞ্জুর হবে না, সে ভরসা করি।

ইন্দু আরও বিরক্ত হইল। প্রশ্ন করিল, তবে পেশ হয়নি কেন? খবর ত তোমাকে আমি বেলা থাকতেই পাঠিয়েছিলুম।

তখন সাহস হ'ল না বৌ। অফিস থেকে এসেই বললেন, মাথা ধরেছে। ভাবলুম, জলটল খেয়ে একটু ঘুরে আসুন, মনটা প্রফুল্ল হোক—তখন জানাব। এখনও ত দেরি আছে, একটু ব'সো না ভাই, তিনি ফিরে এলেন বলে।

কি জানি, কিসে তোমার হাসি আসে ঠাকুরঝি! আমি এমন হলে লজ্জায় মরে যেতুম। আচ্ছা, ঝিকে কিংবা বেহারাটাকে বলে কি যেতে পার না?

বিমলা সভয়ে বলিল, বাপ রে! তা হলে বাড়ি থেকে দূর করে দেবেন—এ জন্মে আর মুখ দেখবেন না।

ইন্দু ক্রোধে বিস্ময়ে অবাক হইয়া কহিল, দূর করে দেবেন! কোন্ আইনে? কোন্ অধিকারে শুনি?

বিমলা নিতান্ত সহজভাবে জবাব দিল, বাধা কি বৌ! তিনি মালিক—আমি দাসী বৈ ত নয়। তিনি তাড়ালে, কে তাঁকে ঠেকাবে বল?

ঠেকাবে রাজা। ঠেকাবে আইন। সে চুলোয় যাক গে ঠাকুরঝি, কিন্তু নিজের মুখে নিজেকে দাসী বলে কবুল করতে কি একটু লজ্জা হয় না? স্বামী কি মোগল বাদশা? আর স্ত্রী কি তাঁর ক্রীতদাসী যে, আপনাকে আপনি এমন হীন, এমন তুচ্ছ করে গৌরব বোধ করচ?

এই ক্রোধটুকু লক্ষ্য করিয়া বিমলা আমোদ বোধ করিল, কহিল, তোমার ঠাকুরঝি যে মুখ্যু মেয়েমানুষ বৌ, তাই নিজেকে স্বামীর দাসী বলে গৌরব বোধ করে। আচ্ছা,

জিজ্ঞাসা করি ভাই, তুমি যে এত কথা বলচ, তুমিই কি বাড়ি থেকে বেরিয়েচ দাদার হুকুম না নিয়ে?

হুকুম? কেন, কি জন্যে? তিনি নিজে যখন কোথাও যান—আমার হুকুমের অপেক্ষা করেন কি? আমি যাচ্ছি, শুধু এই কথা তাঁকে জানিয়ে এসেচি। নিমেষমাত্র মৌন থাকিয়া, অকস্মাৎ উদ্দীপ্ত হইয়া কহিল, তবে এ কথা মানি যে, আমার মত গুণের স্বামী কম মেয়েমানুষের ভাগ্যে জোটে। আমার কোন ইচ্ছেতেই তিনি বাধা দেন না। কিন্তু এমন যদি না-ও হ'ত, তিনি যদি নিতান্তই অবিবেচক হতেন, তা হলেও তোমাকে বলচি ঠাকুরঝি, আমি নিজের সম্মান ষোল আনা বজায় রাখতে পারতুম; কিছুতেই তোমাদের মত এ কথা ভুলতে পারতুম না যে, আমি সঙ্গিনী, সহধর্মিণী—তাঁর ক্রীতদাসী নই। জানো ঠাকুরঝি, এমনি করেই আমাদের দেশের সমস্ত মেয়েমানুষ পুরুষের পায়ে মাথা মুড়িয়ে এত তুচ্ছ, এমন খেলার পুতুল হয়ে দাঁড়িয়েচে। নিজের সম্ভ্রম নিজে না রাখলে, কেউ কি যেচে দেয় ঠাকুরঝি?— কেউ না। আমার ত এমন স্বামী, তবুও কখনও তাঁকে আমি এ কথা ভাববার অবকাশ দিইনি—তিনিই প্রভু, আর আমি স্ত্রী বলেই তাঁর বাঁদী। আমার নারীদেহেও ভগবান বাস করেন, এ কথা আমি নিজেও ভুলিনি—তাঁকেও ভুলতে দিইনে।

বিমলা চুপ করিয়া শুনিয়া একটু নিঃশ্বাস ফেলিল; কিন্তু তাহাতে লজ্জা বা অনুশোচনা কিছুই প্রকাশ পাইল না। কহিল, জানিনে বৌ, আত্মসম্ভ্রম আদায় করা কি; কিন্তু তাঁর পায়ে আত্মবিসর্জন দেওয়াটা বুঝি। ঐ যে উনি এলেন; একটু ব' সো ভাই; আমি শিগগির হুকুম নিয়ে আসি, বলিয়া হঠাৎ একটু মুখ টিপিয়া হাসিয়া দ্রুতপায়ে প্রস্থান করিল।

ইন্দু এ হাসিটুকু দেখিতে পাইল। তাহার সর্বাঙ্গ রাগে রি রি করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

বায়স্কোপ হইতে ফিরিবার পথে ইন্দু হঠাৎ বলিয়া উঠিল, ঠাকুরঝি, হুকুম না পেলে ত তুমি আসতে পারতে না।

বিমলা পথের দিকে চাহিয়া অন্যমনস্ক হইয়া কি জানি কি ভাবিতেছিল, বলিল, না।

তাই আমার মনে হয় ঠাকুরঝি, আমি যখন-তখন এসে তোমাকে ধরে নিয়ে যাই বলে, তোমার স্বামী হয়ত রাগ করেন।

বিমলা মুখ ফিরাইয়া কহিল, তা হলে আমি নিজেই বা যাব কেন বৌ! বরং আমার ভয় হয়, তুমি এমন করে এসো বলে দাদা হয়ত মনে মনে আমার উপর বিরক্ত হন।

ইন্দু সগর্বে কহিল, তোমার দাদার সে স্বভাব নয়। একে ত কখনো তিনি নিজের অধিকারের বাইরে পা দেন না, তা ছাড়া আমার কাজে রাগ করবেন, আমি ঠিক জানি, এ স্পর্ধা তাঁর স্বপ্নেও আসে না।

বিমলা মিনিট-দুই স্থির থাকিয়া, গভীর একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, বৌ, দাদা তোমাকে কি ভালই না বাসেন। কিন্তু তুমি বোধ করি–

এতক্ষণে ইন্দুর মুখে হাসি ফুটিল। কহিল, তাঁর কথা অস্বীকার করিনে; কিন্তু আমার সম্বন্ধে তোমার সন্দেহ হ'ল কিসে?

তা জানিনে বৌ। কিন্তু মনে হয় যেন–

কেন হয় জান ঠাকুরঝি, তোমাদের মত পায়ে লুটিয়ে-পড়া ভালবাসা আমার নেই বলে। আর ঈশ্বর করুন আমার নারী-মর্যাদাকে ডিঙিয়ে যেন কোনদিন আমার ভালবাসা মাথা তুলে উঠতে না পারে। যে ভালবাসা আমার স্বাধীন সত্তাকে লঙ্ঘন করে যায়, সে ভালবাসাকে আমি আন্তরিক ঘৃণা করি।

বিমলা গোপনে শিহরিয়া উঠিল।

মিনিট-খানেক চুপ করিয়া থাকিয়া ইন্দু কহিল, কথা কও না যে ঠাকুরঝি! কি ভাবচ?

কিছু না। প্রার্থনা করি, দাদা তোমাকে চিরদিন এমনিই ভালবাসুন; কারণ, যতই কেন বল না, বৌ, মেয়েমানুষের স্বামীর ভালবাসার চেয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও বড় নয়। মুহূর্তকাল মৌন থাকিয়া বিমলা পুনরায় কহিল, কি জানি, কি তোমার নারীমর্যাদা—আর কি তোমার স্বাধীন সত্তা! আমি ত আমার সমস্তই তাঁর পায়ে ডুবিয়ে দিয়ে বেঁচেচি। সত্যি বলচি বৌ, আমার ত এমনি দশা হয়েছে, নিজের ইচ্ছে বলেও যেন আর কিছু বাকি নেই। তাঁর ইচ্ছেই—

ছি ছি, চুপ কর—চুপ কর—

বিমলা চমকিয়া চুপ করিল। ইন্দু ঘৃণাভরে বলিতে লাগিল। আমাদের দেশের মেয়েরা কি মাটির পুতুল? প্রাণ নেই, আত্মা নেই—কিচ্ছু! আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, এত করে কি পেয়েচ? আমার চেয়ে বেশি ভালবাসা আদায় করতে পেরেচ কি? ঠাকুরঝি, ভালবাসা মাপবার যে যন্ত্র নেই, নইলে মেপে দেখাতে পারতুম—যাক সে কথা—কিন্তু কেন জান? নিজেকে তোমাদের মত নিচু করিনি বলে—তোমাদের এই কাঙাল-বৃত্তি মাথায় তুলে নিইনি বলে। আমার ভারি দুঃখ হয় ঠাকুরঝি, কেন তিনি এত শান্ত, এত নিরীহ। কিছুতেই একটা কথা বলেন না—নইলে দেখিয়ে দিতুম, তিনি যাকে গ্রাহ্য করেন না, সেও মানুষ; সেও অগ্রাহ্য করতে জানে। সেও আত্মমর্যাদা হারিয়ে ভালবাসা চায় না।

ও আবার কি? মুখ ফিরিয়ে হাসচ যে?

বিমলা জোর করিয়া হাসি চাপিয়া বলিল, কৈ—না।

না কেন? এখনো ত তোমার ঠোঁটে হাসি লেগে রয়েচে।

বিমলা হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, লেগে রয়েচে তোমার কথা শুনে। ওগো বৌ, অনেক পেয়েচ বলেই এত কথা বেরুচ্ছে।

ইন্দু ক্রুদ্ধমুখে জিজ্ঞাসা করিল, না পেলে?

বেরুত না।

ভুল—নিছক ভুল। ঠাকুরঝি, সকলেই তোমার মত নয়—সকলেই ভিক্ষে চেয়ে বেড়ায় না।আত্মগৌরব বোঝে, এমন নারীও সংসারে আছে।

এবার বিমলার মুখের হাসি ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল; বলিল, তা জানি।

জানলে আর বলতে না। যাই হোক, এখন থেকে জেনো, যে ভিক্ষে চায় না, নিজের জোরে আদায় করে, এমন লোকও আছে।

বিমলা ব্যথিত স্বরে বলিল, আচ্ছা। এই যে বাড়ি এসে পড়েচি। একবার নামবে না কি?

নাঃ—আমিও বাড়ি যাই। গাড়োয়ান, ঐ ও গলিতে—

দাদাকে আমার প্রণাম দিও বৌ!

দেবো,—গাড়োয়ান চলো—

.

দুই

আর নেই—সংসার-খরচের কিছু টাকা দিতে হবে যে।

স্ত্রীর প্রার্থনায় নরেন্দ্র আশ্চর্য হইল। কহিল, এর মধ্যেই দু'শ টাকা ফুরিয়ে গেল?

না গেলে কি মিথ্যে কথা বলচি; না, লুকিয়ে রেখে চাইচি?

নরেন্দ্রর চোখে-মুখে একটা ভয়ের ছায়া পড়িল। কোথায় টাকা? কি করিয়া সংগ্রহ করিবে?

সেই মুখের ভাব ইন্দু দেখিল, কিন্তু ভুল করিয়া দেখিল। কহিল, বিশ্বাস না হয় এখন থেকে একটা খাতা দিয়ো, হিসেব লিখে রাখব। কিংবা এক কাজ কর না—খরচের টাকাকড়ি নিজের হাতেই রেখ—তাতে তোমারও ভয় থাকবে না, আমিও সংশয়ের লজ্জা থেকে রেহাই পাব। বলিয়া তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল তাঁহার মুখের গাঢ় ছায়া বেদনায় গাঢ়তর হইয়াছে।

নরেন্দ্র ধীরে ধীরে বলিল, অবিশ্বাস করিনে, কিন্তু—

কিন্তু কি? বিশ্বাসও হয় না—এই ত? আচ্ছা যাচ্ছি, যতটা পারি, হিসেব লিখে আনি। উঃ—কি সুখের ঘরকন্নাই হয়েছে আমার! বলিয়া সক্রোধে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কিন্তু, তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া কহিল, কিন্তু কেন? কিসের জন্য হিসেব লিখতে যাব! আমি কি মিথ্যে বলি? আমার মামাত বোনের বিয়েতে কাপড়-জামা লাগল—পঞ্চাশ টাকার ওপর।

কমলার জামা দুটোর দাম বার টাকা—সেদিন বায়স্কোপে খরচ হ'ল দশ-বার টাকা। খতিয়ে দেখ দেখি, বাকি থাকে কত? তাতে এই দশ-পনের দিন সংসার-খরচটা কি এমনি বেশি যে, তোমার দুই চোখ কপালে উঠছে! আমার দাদার সংসারে মাসে সাত-আট শ' টাকাতেও যে হয় না। সত্যি বলচি, এমন করলে আমি ত আর ঘরে টিকতে পারিনে। তার চেয়ে বরং স্পষ্ট বল, দাদা মেদিনীপুরে বদলি হয়েছেন, আমি মেয়ে নিয়ে চলে যাই, আমিও জুড়োই, তুমিও বাঁচ!

নরেন্দ্র অনেকক্ষণ ঘাড় হেঁট করিয়া থাকিয়া, মুখ তুলিয়া কহিল, এ-বেলায় ত হবে না, দেখি যদি ও-বেলায় কিছু যোগাড় করতে পারি।

তার মানে? যদি যোগাড় না করতে পার, ত উপোস করতে হবে নাকি? দেখ, কালই আমি মেদিনীপুরে যাব। কিন্তু তুমি এক কাজ কর। এই দালালী ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে, দাদাকে ধরে একটা চাকরি যোগাড় করে নাও। তাতে বরঞ্চ ভবিষ্যতে থাকবে ভাল; কিন্তু যা পার না, তাতে হাত দিয়ে নিজেও মাটি হ'য়ো না, আমাকে নষ্ট ক'রো না।

নরেন্দ্র জবাব দিল না। ইন্দু আরও কি বলিতে যাইতেছিল; কিন্তু এই সময়ে বেহারাটা শম্ভুবাবুর আগমন সংবাদ জানাইল, এবং পরক্ষণেই বাহিরে জুতার পদশব্দ শোনা গেল। ইন্দু পার্শ্বের দ্বার দিয়া পর্দার আড়ালে সরিয়া দাঁড়াইল।

শম্ভুবাবু মহাজন। নরেন্দ্রর পিতা বিস্তর ঋণ করিয়া স্বর্গীয় হইয়াছেন। পুত্রের কাছে তাগাদা করিতে শম্ভুবাবু প্রায়ই শুভাগমন করিয়া থাকেন। আজিও উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি মৃদুভাষী। আসন গ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে এমন গুটি-কয়েক কথা বলিলেন, যাহা দ্বিতীয়বার শুনিবার পূর্বে অতি-বড় নির্লজ্জও নিজের মাথাটা বিক্রয় করিয়া ফেলিতে দ্বিধা করিবে না। শম্ভুবাবু প্রস্থান করিলে, ইন্দু আর একবার সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল, ইনি কে?

শম্ভুবাবু।

তার পরে?

কিছু টাকা পাবেন, তাই চাইতে এসেছিলেন।

সে টের পেয়েছি। কিন্তু ধার করেছিলে কেন?

নরেন্দ্র এ প্রশ্নের জবাবটা একটু ঘুরাইয়া দিল। কহিল, বাবা হঠাৎ মারা গেলেন, তাই–

ইন্দু অতিশয় রুক্ষস্বরে বলিল, তোমার বাবা কি পৃথিবীসুদ্ধ লোকের কাছে দেনা করে গেছেন? এ শোধ করবে কে? তুমি? কি করে করবে শুনি?

এতগুলো প্রশ্নের এক নিঃশ্বাসে জবাব দেওয়া যায় না। ইন্দু নিজেও সেজন্য অপেক্ষা করিয়া রহিল না–তৎক্ষণাৎ কহিল, বেশ ত, তোমার বাবা না হয় হঠাৎ মারা গেছেন, কিন্তু তুমি ত হঠাৎ বিয়ে করনি। বাবাকে এ-সব ব্যাপার তোমার ত জানান উচিত ছিল। আমাকে গোপন করাও ত কর্তব্য হয়নি। লোকের মুখে শুনি তুমি ভারি ধর্মভীরু লোক, বলি এ-সব বুঝি তোমার ধর্মশাস্ত্রে লেখে না? বলিয়া ঠিক যেন যুদ্ধ করিয়া স্বামীর মুখপানে চাহিয়া রহিল।

কিন্তু হায় রে, এতগুলো সুতীক্ষ্ণ বাণ যাহার উপর এমন নিষ্ঠুরভাবে বর্ষিত হইল, ভগবান তাহাকে কি নিরস্ত্র, কি নিরুপায় করিয়াই সংসারে পাঠাইয়াছিলেন! কাহাকেও কোন কারণেই প্রতিঘাত করিবার সাধ্যটুকুও তাহার ছিল না; শুধু সাধ্য ছিল সহ্য করিবার। আঘাতের সমস্ত বেদনাই তাহার নিজের মধ্যে পাক খাইয়া, অত্যল্প সময়ের মধ্যে স্তব্ধ হইয়া যাইত; কিন্তু সেই স্বল্প সময়টুকুও আজ তাহার মিলিল না। শম্ভুবাবুর অত্যুগ্র কথার জ্বালা কণামাত্র শান্ত হইবার পূর্বেই ইন্দু তাহাতে এমন ভীষণ তীব্র জ্বালা সংযোগ করিয়া দিল যে, তাহারই অসহ্য দহনে আজ সেও প্রত্যুত্তরে একটা কঠোর কথাই বলিতে উদ্যত হইয়া উঠিল; কিন্তু শেষ রক্ষা করিতে পারিল না। অক্ষমের নিষ্ফল আড়ম্বর মাথা তুলিয়াই ফাটিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। শুধু ক্ষীণস্বরে বলিল, বাবার সম্বন্ধে তোমার কি এমন করে বলা উচিত?

না–উচিত নয়–কিন্তু আমার উচিত-অনুচিতের কথা তোমাকে মীমাংসা করে দিতে ত বলিনি। কেন তোমাদের সমস্ত ব্যাপার বাবাকে খুলে বলনি?

আমি কিছুই গোপন করিনি ইন্দু। তা ছাড়া, তিনি বাবার বাল্যবন্ধু ছিলেন, নিজেই সমস্ত জানতেন।

তা হলে বল সমস্ত জেনে-শুনেই বাবা আমাকে জলে ফেলে দিয়েছেন!

অসহ্য ব্যথায় ও বিস্ময়ে নরেন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া থাকিয়া শির নত করিল। স্ত্রীর এই ক্রোধ যথার্থই সত্য কিংবা কলহের ছলনা মাত্র, হঠাৎ সে যেন ঠাহর করিতে পারিল না।

এখানে গোড়ার কথা একটু বলা আবশ্যক। এক সময়ে বহুকাল উভয় পরিবার পাশাপাশি বাস করিয়াছিলেন এবং বিবাহটা সেই সময়েই একরূপ স্থির হইয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ এক সময়ে ইন্দুর পিতা নিজের মত-পরিবর্তন করিয়া, মেয়েকে একটু অধিক বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইতে মনস্থ করায় বিবাহ-সম্বন্ধও ভাঙ্গিয়া যায়। কয়েক বর্ষ পরে ইন্দুর আঠার বৎসর বয়সে আবার যখন কথা উঠে, তখন কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া শুনেন নরেন্দ্রর পিতার মৃত্যু হইয়াছে। সে সময় তাহার সাংসারিক অবস্থা ইন্দুর পিতা-মাতা যথেষ্ট পর্যালোচনা করিয়াছিলেন; এমন কি, তাঁহাদের মত পর্যন্ত ছিল না; শুধু বয়স্থা ও শিক্ষিতা কন্যার প্রবল অনুরাগ উপেক্ষা করিতে না পারিয়াই অবশেষে তাঁহারা সম্মত হইয়াছিলেন।

এত কথা এত শীঘ্র ইন্দু যথার্থই ভুলিয়াছে কিংবা মিথ্যা মোহে অন্ধ হইয়া নিজেকে প্রতারিত করিবার নিদারুণ আত্মগ্লানি এখন এমন করিয়া তাহাকে অহরহ জ্বালাইয়া তুলিতেছে, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া নরেন্দ্র স্তব্ধ-নিরুত্তরে মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল।

সেই নির্বাক স্বামীর আনত মুখের প্রতি ক্ষণকাল দৃষ্টিপাত করিয়া, ইন্দু আর কোন কথা না বলিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। সে নিঃশব্দে গেল বটে—এমন অনেক দিন গিয়াছে; কিন্তু আজ অকস্মাৎ নরেন্দ্রর মনে হইল, তাহার বুকে বড় বেদনার স্থানটা ইন্দু

যেন ইচ্ছাপূর্বক জোর করিয়া মাড়াইয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল। একবার ঈষৎ একটু ঘাড় তুলিয়া স্ত্রীর নিষ্ঠুর পদক্ষেপে চাহিয়া দেখিল; যখন আর দেখা গেল না, তখন গভীর—অতি গভীর একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া নির্জীবের মত সেইখানে শুইয়া পড়িল। সহসা আজ প্রথমে মনে উদয় হইল, সমস্ত মিথ্যা—সব ফাঁকি। এই সংসার, স্ত্রী-কন্যা, স্নেহ-প্রেম—সমস্তই আজ তাহার কাছে মরুভূমির মরীচিকার মত উবিয়া গেল।

.

তিন

কে রে, বিমল? আয় বোন বোস! বলিয়া নরেন্দ্র শয্যার উপরে উঠিয়া বসিল। তাহার উভয় ওষ্ঠপ্রান্তে ব্যথার যে চিহ্নটুকু প্রকাশ পাইল, তাহা বিমলার দৃষ্টি এড়াইল না।

অনেক দিন দেখিনি দিদি, ভাল আছিস ত?

বিমলার চোখ দুটি ছলছল করিয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে শয্যাপ্রান্তে আসিয়া বলিল, কেন দাদা, তোমার অসুখের কথা আমাকে এতদিন জানাও নি?

অসুখ তেমন কিছুই ছিল না বোন, শুধু সেই বুকের ব্যাথাটা একটু—

বিমলা হাত দিয়া এক ফোঁটা চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, একটু বৈ কি! উঠে বসতে পার না—ডাক্তার কি বললে?

ডাক্তার? ডাক্তার কি হবে রে, ও আপনি সেরে যাবে।

এ্যাঁ! ডাক্তার পর্যন্ত ডাকাও নি? ক'দিন হল?

নরেন্দ্র একটুখানি হাসিয়া বলিল, ক'দিন? এই ত সেদিন রে। দিন-সাতেক হবে বোধ হয়।

সাত দিন! তা হলে বৌ সমস্ত দেখেই গেছে!

না না, দেখে যায়নি বোধ হয়—অসুখ আমার নিশ্চয় সে বুঝতে পারেনি। আমি তার যাবার দিনও উঠে গিয়ে বাইরে বসে ছিলুম। না না, হাজার হোক তাই কি তোরা পারিস বোন?

বৌ তা হলে রাগ করে গেছে, বল?

না, রাগ নয়, দুঃখ-কষ্ট—কত অভাব জানিস ত? ওদের এ-সব সহ্য করা অভ্যাস নেই, দেহটাও তার বড় খারাপ হয়েচে, নইলে অসুখ দেখলে কি তোরা রাগ করে থাকতে পারিস?

বিমলা অশ্রু চাপিয়া কঠিনস্বরে বলিল, পারি বৈ কি দাদা, আমাদের অসাধ্য কাজ কিছু নেই। না হলে, তোমরা বিছানায় না শোয়া পর্যন্ত আর আমাদের চোখে পড়ে না! ভোলা, পালকি এলো রে?

আনতে পাঠিয়েছি মা।

এর মধ্যেই যাবি দিদি? এখনো ত সন্ধ্যে হয়নি, আর একটু বোস না?

না দাদা, সন্ধ্যে হলে হিম লাগবে। ভোলা, পালকি একেবারে ভিতরে আনিস।

ভিতরে কেন, বিমল?

ভেতরেই ভাল দাদা। এই ব্যাথা নিয়ে তোমার বাইরে গিয়ে উঠতে কষ্ট হবে।

আমাকে নিয়ে যাবি? এই পাগল দেখ! কি হয়েচে যে, এত কাণ্ড করতে হবে? এ ত আমার প্রায়ই হয়। প্রায়ই সেরে যায়।

তাই যাক দাদা। কিন্তু ভাই ত আমার আর নেই যে, তোমাকে হারালে আর একটি পাব। ঐ যে পালকি—এই র‍্যাপারখানা বেশ করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ো। ভোলা, আর একটু এগিয়ে আনতে বল—না দাদা, এ সময়ে তোমাকে চোখে চোখে না রাখতে পারলে আমার তিলার্ধ স্বস্তি থাকবে না।

কিন্তু, নিয়ে যেতে চাইবি বুঝলে যে তোকে আমি খবরই দিতুম না।

বিমলা মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, তোমাদের বোঝা তোমাদেরই থাক দাদা, আমাকে আর শুনিয়ো না। আচ্ছা, কি করে মুখে আনলে বল ত? এই অবস্থায় তোমাকে একলা ফেলে রেখে যেতে পারি? সত্যি কথা বল!

নরেন্দ্র একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তবে চল যাই।

দাদা!

কি রে?

আজ রাত্রেই বৌকে একখানা টেলিগ্রাম করে দিই, কাল সকালেই চলে আসুক।

নরেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া উঠিল—না, না, সে দরকার নেই।

কেন নেই? মেদিনীপুর ত বেশি দূর নয়, একবার আসুক, না হয় আবার চলে যাবে।

না রে বিমল, না। সত্যিই তার দেহটা ভাল নেই—দু'দিন জুড়োক।

একটুখানি থামিয়া বলিল, বিমল, আমি তোর কাছে থেকে ভাল না হতে পারি ত আর কিছুতেই পারব না। হাঁ রে, আমি যে যাচ্চি, গগনবাবু শুনেচেন?

বেশ যা হোক তুমি! তিনি ত এখনো অফিস থেকেই ফেরেন নি।

তবে?

তবে আবার কি? তোমার ভয় নেই দাদা, তাঁর বেশ বড় বড় দুটো চোখ আছে, আমরা গেলেই দেখতে পাবেন।

নরেন্দ্র বিছানায় শুইয়া পড়িয়া কহিল, বিমল, আমার যাওয়া ত হতে পারে না।

বিমল অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন ?

গগনবাবুর অমতে–

অমন করলে মাথা খুঁড়ে মরব দাদা! একটা বাড়ির মধ্যে কি ভিন্ন ভিন্ন মত থাকে যে, আমাকে অপমান করচ?

অপমান করচি? ঠিক জানিস বিমল, ভিন্ন মত থাকে না?

বিমলা আবশ্যক বস্ত্রাদি গুছাইয়া লইতেছিল, সলজ্জে মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

দাদা, আজ ব্যথাটা তত টের পাচ্চ না, না?

একেবারে না। এ আট দিন তোদের কি কষ্টই না দিলুম–এখন বিদেয় কর দিদি।

করব কার কাছে? আচ্ছা দাদা, এই ষোল-সতের দিনের মধ্যে বৌ একখানা চিঠি পর্যন্ত দিলে না?

না, দিয়েচেন বৈ কি। পৌঁছান-সংবাদ দিয়েছিলেন, কালও একখানা পেয়েচি—বরং, আমিই জবাব দিতে পারিনি ভাই।

বিমলা মুখ ভার করিয়া নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। নরেন্দ্র লজ্জায় কুণ্ঠিত হইয়া বলিতে লাগিল, সেখানে গিয়ে পর্যন্ত সে ভাল নেই—সর্দি-কাসি, পরশু একটু জ্বরের মতও হয়েছিল, তবু তার ওপরেই চিঠি লিখছেন।

আজ তাই বুঝি সেখানে টাকা পাঠিয়ে দিলে?

নরেন্দ্র অধিকতর লজ্জিত হইয়া পড়িল। কহিল, কিছুই ত তার হাতে ছিল না—বাড়ির পাশেই একটা মেলা বসচে,—লিখেচেন, সেটা শেষ হয়ে গেলেই ফিরতে পারবেন—তোমাকে বুঝি চিঠিপত্র লিখতে পারেন নি?

পেরেচেন বৈ কি। কাল আমিও একখানা চারপাতা-জোড়া চিঠি পেয়েচি—

পেয়েছিস? পাবি বৈ কি—তার জবাবটা—

তোমার ভয় নেই দাদা—তোমার অসুখের কথা লিখবো না। আমার নষ্ট করবার মত অত সময় নেই। বলিয়া বিমলা ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে খোলা জানালার ভিতর দিয়া লাল আকাশের পানে চাহিয়া নরেন্দ্র স্তব্ধভাবে বসিয়া ছিল, বিমলা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, চুপ করে কি ভাবছ দাদা?

নরেন্দ্র মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিল, কিছুই ভাবিনে বোন, মনে মনে তোকে আশীর্বাদ করছিলুম, যেন এমনি সুখেই তোর চিরদিন কাটে।

বিমলা কাছে আসিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া একটা চৌকির উপর বসিল।

আচ্ছা, দুপরবেলা অত রাগ করে চলে গেলি কেন বল ত?

আমি অন্যায় সইতে পারিনে। কেন তুমি অত–

অত কি বল? ইন্দুর দিক থেকে একবার চেয়ে দেখ দেখি? আমি ত তাকে সুখে রাখতে পারিনি?

সুখে থাকতে পারার ক্ষমতা থাকা চাই দাদা! সে যা পেয়েছে এত ক'জন পায়? কিন্তু সৌভাগ্যকে মাথায় তুলে নিতে হয়; নইলে–কথাটা শেষ করিবার পূর্বেই বিমলা লজ্জায় মাথা হেঁট করিল।

নরেন্দ্র নীরবে স্নিগ্ধ-সস্নেহ দৃষ্টিতে ভগিনীটির সর্বাঙ্গ অভিষিক্ত করিয়া দিয়া, ক্ষণকাল পরে কহিল, বিমল, লজ্জা করিস নে দিদি, সত্য বল ত, তুই কখনো ঝগড়া করিস নে?

উনি বলেচেন বুঝি? তা ত বলবেনই।

নরেন্দ্র মৃদু হাসিয়া বলিল, না, গগনবাবু কিছুই বলেন নি–আমি তোকেই জিজ্ঞাসা করচি।

বিমলা আরক্ত মুখ তুলিয়া বলিল, তোমাদের সঙ্গে ঝগড়া করে কে পারবে বল? শেষে হাতে-পায়ে পড়ে–ওখানে দাঁড়িয়ে কে?

আমি, আমি–গগনবাবু। থামলে কেন–বলে যাও। ঝগড়া করে কার হাতে-পায়ে কাকে পড়তে হয়–কথাটা শেষ করে ফেল।

যাও—যে সাধু-পুরুষ লুকিয়ে শোনে, তার কথায় আমি জবাব দিইনে। বলিয়া, বিমলা কৃত্রিম ক্রোধের আড়ালে হাসি চাপিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

নরেন্দ্র সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া মোটা তাকিয়াটা হেলান দিয়া বসিল। গগনবাবু বলিলেন, এ-বেলায় কেমন আছ হে?

ভাল হয়ে গেছি। এবার বিদায় দাও ভাই।

বিদায় দাও? ব্যস্ত হয়ো না হে—দু'দিন থাকো। তোমার এই বোনটির আশ্রয়ে যে য'টা দিন বাস করতে পায়, তার তত বৎসর পরমায়ু বৃদ্ধি হয়, সে খবর জান?

জানিনে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।

গগনবাবু দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, বিশ্বাস করি কি হে, এ যে প্রমাণ করা কথা। বাস্তবিক নরেনবাবু, এমন রত্নও সংসারে পাওয়া যায়! ভাগ্য! ভাগ্য! ভাগ্যং ফলতি—কি হে কথাটা? নইলে আমার মত হতভাগা যে এ বস্তু পায়, এ ত স্বপ্নের অগোচর! বৌঠাকরুন—না হে না, থেকে যাও দু'দিন—এমন সংসার ছেড়ে স্বর্গে গিয়েও আরাম পাবে না, তা বলে দিচ্চি ভাই।

বিমলা বহু দূরে যায় নাই, ঠিক পর্দার আড়ালেই কান পাতিয়াছিল—চোখ মুছিয়া উঁকি মারিয়া, সেই প্রায়ান্ধকারেও স্পষ্ট দেখিতে পাইল, তাহার স্বামীর কথাগুলা শুনিয়া নরেনদাদার মুখখানা একবার জ্বলিয়া উঠিয়াই যেন ছাই হইয়া গেল।

.

চার

দিন-পনের পরে দুপুরের গাড়িতে ইন্দু মেয়ে লইয়া মেদিনীপুর হইতে ফিরিয়া আসিল। স্ত্রী ও কন্যাকে সুস্থ সবল দেখিয়া নরেন্দ্রর শীর্ণ পাণ্ডুর মুখ মুহূর্তে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সাগ্রহে ঘুমন্ত কন্যাকে বুকে টানিয়া লইয়া প্রশ্ন করিল, কেমন আছ ইন্দু?

বেশ আছি। কেন?

তোমার জ্বরের মত হয়েছিল শুনে ভারী ভাবনা হয়েছিল। সেরে গেছে?

না হলে ডাক্তার ডাকাবে না কি?

নরেন্দ্রর হাসিমুখ মলিন হইল। কহিল, না, তাই জিজ্ঞাসা করচি।

কি হবে করে? এদিকে ত পঞ্চাশটি টাকা পাঠিয়ে চিঠির ওপর চিঠি যাচ্ছিল—কেমন আছ—কেমন আছ—সাবধানে থেকো—সাবধানে থেকো। আমি কি কচি খুকি, না, পঞ্চাশটি টাকা দাদা আমাকে দিতে পারতেন না? ও টাকা পাঠিয়ে সকলের কাছে আমার মাথা হেঁট করে দেবার কি দরকার ছিল? সেদিন বাড়িতে যেন একটা হাসি পড়ে গেল।

নরেন্দ্র ম্লান মুখ আরো ম্লান করিয়া অস্ফুটে কহিল, যোগাড় করতে পারলুম না।

না পাঠিয়ে তাই কেন লিখে দিলে না? উঃ—আবার সেই নিত্য নেই নেই—দাও দাও—বেশ ছিলুম এতদিন। বাস্তবিক বড়লোকের মেয়ে গরীবের ঘরে পড়ার মত মহাপাপ আর সংসারে নেই, বলিয়া সেই পরম সত্যে স্বামীর হৃদয় পূর্ণ করিয়া দিয়া ইন্দু অন্যত্র চলিয়া গেল।

মাসাধিক পরে স্বামী-স্ত্রীর এই প্রথম সাক্ষাৎ।

বাহিরে আসিয়া ইন্দু ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, নিজের শোবার ঘরে ঢুকিয়া ভারি আশ্চর্য হইয়া দেখিল, বাড়ির অন্যান্য স্থানের মত এখানেও সমস্ত বস্তু রীতিমত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হইতেছে। জিজ্ঞাসা করিল, এত ঝাড়ামোছা হচ্ছে কেন রে?

নূতন ঝি বলিল, আপনি আসবেন বলে।

আমি আসব বলে?

হাঁ মা, বাবু তাই ত বলে দিলেন। আপনি ময়লা কিছু দেখতে পারেন না—আজ তিন দিন থেকে তাই—

ইন্দু অন্তরের মধ্যে একটা বড়-রকমের গর্ব অনুভব করিল। কিন্তু সহজভাবে বলিল, ময়লা আবার কে দেখতে পারে? তবু ভাল যে—

হাঁ মা, লোক লাগিয়ে ওপর-নীচে সমস্ত সাফ করা হয়েচে।

ঝি, রামটহলটাকে একবার ডেকে দাও ত, বাজার থেকে কিছু ফলমূল কিনে আনুক।

ফলটল ত সব আছে মা। বাবু আজ সকালে নিজে বাজারে গিয়ে সমস্ত খুঁটিয়ে কিনে এনেছেন।

ডাব আছে? আঙুর—

আছে বৈ কি। এখনি নিয়ে আসচি, বলিয়া দাসী চলিয়া গেল। ইন্দুর মুখের উপর হইতে বিরক্তির মেঘখানা সম্পূর্ণ উড়িয়া গেল। বরং অনতিপূর্বে স্বামীর মলিন মুখখানা বুকের কোথায় যেন একটু খচখচ করিতেও লাগিল।

বিশ্রাম করিয়া ঘণ্টা-দুই পরে সে প্রসন্নমুখে স্বামীর বসিবার ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, নরেন্দ্র চশমা খুলিয়া খুব ঝুঁকিয়া বসিয়া কি লিখিতেছে। কহিল, অত মন দিয়ে কি লেখা হচ্ছে?—কবিতা?

নরেন্দ্র মুখ তুলিয়া বলিল, না।

কি তবে?

ও কিছু নে, বলিয়া সে লেখাগুলা চাপা দিয়া রাখিল।

ইন্দুর প্রসন্ন মুখ মেঘাবৃত হইয়া উঠিল। কহিল, তা হলে 'কিছু না'র উপর অত ঝুঁকে না পড়ে বরং যাতে দুঃখ-কষ্ট ঘোচে এমন কিছুতেই মন দাও। শুনলুম, দাদার হাতে নাকি গোটাকতক চাকরি খালি আছে। বলিয়া ভাল করিয়া স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। সে নিশ্চয় জানিত, এই চাকুরি করার কথাটা তাঁহাকে চিরদিন আঘাত করে। আজ কিন্তু আশ্চর্য হইয়া দেখিল, আঘাতের কোন বেদনাই তাঁহার মুখে প্রকাশ পাইল না।

নরেন্দ্র শান্তভাবে বলিল, চাকরি করবার লোকও সেখানে আছে।

এই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত উত্তরে ইন্দু ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। ক্ষণকাল অবাক হইয়া থাকিয়া বলিল, তা জানি। কিন্তু সেখানে আছে, এখানে নেই নাকি? আজকাল ভাল কথা বললে যে, তোমার মন্দ হয় দেখচি। ঘরের কোণে ঘাড় গুঁজে বসে কবিতা লিখতে তোমার লজ্জা করে না? বলিয়া সে চোখ-মুখ রাঙ্গা করিয়া ঘর ছাড়িয়া গেল। এই দ্বিতীয় সাক্ষাৎ।

অ্যাঁ—এ যে বৌ! কখন এলে?

পরশু দুপর বেলা।

পরশু—দুপর বেলা! তাই এত তাড়াতাড়ি আজ সন্ধ্যাবেলায় দেখা দিতে এসেচ? না ভাই বৌ, টানটা একটু কম ক'রো!

ইন্দু ঘাড় নাড়িয়া কহিল, চিঠি লিখে জবাব পর্যন্ত পাইনে। আমি একা আর কত টানব ঠাকুরঝি?

বিমলা আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, জবাব পাওনি?

সে না পাওয়াই। চার পাতার জবাব চার ছত্র ত?

বিমলা অপ্রতিভ হইয়া বলিল, তখন একটুকু সময় ছিল না ভাই। এ ঘরে দাদা যদি বা একটু সারলেন, ওদিকে আমার নতুন ভাড়াটে যায় যায়।

ইন্দু কথাটার একবর্ণও বুঝিল না। হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল।

বিমলা সেদিকে মনোযোগ না করিয়া বলিতে লাগিল, সেই মঙ্গলবারটা আমার চিরকাল মনে থাকবে। সাতদিনের দিন খবর পায়ে দাদাকে নিয়ে এলুম, তার দু' দিন পরে দাদার বুকের ব্যথার যেমন বাড়াবাড়ি, অম্বিকাবাবুর অসুখটাও তেমনি বেড়ে উঠল—তোমাকে বলব কি বৌ, সেঁক দিতে দিতে আর ফোমেণ্ট করতে করতে বাড়িসুদ্ধ লোকের হাতের চামড়া উঠে গেল—সারা দিন-রাত কারু নাওয়া-খাওয়া পর্যন্ত হ'লো না। হাঁ, সতী-সাধ্বী বলি ওই অম্বিকাবাবুর স্ত্রীকে। ছেলেমানুষ বৌ কিন্তু কি যত্ন, কি স্বামীসেবা! তার পুণ্যেই এ যাত্রা তিনি রক্ষে পেয়ে গেলেন—নইলে ডাক্তার-বদ্যির সাধ্য ছিল না।

অম্বিকাবাবু কে?

কি জানি ঘাটালের কাছে কোথায় বাড়ি। চিকিৎসার জন্যে এখানে এসে আমাদের ঐ পাশের বাড়িটা ভাড়া নিয়েচেন। লোকজন নেই, পয়সা-কড়িও নেই, শুধু বৌটি—

ইন্দু মাঝখানেই প্রশ্ন করিল, তোমাদের দাদার বুঝি খুব বেড়েছিল?

বিমলা ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত করিয়া কহিল, সে রাতে আমার ত সত্যিই ভয় হয়েছিল। ঐ তাকের ওপর ওষুধের খালি শিশিগুলো চেয়ে দেখ না—তিনজন ডাক্তার—আর,—আচ্ছা, বৌ, দাদা বুঝি এ-সব কথা তোমাকে চিঠিতে লেখেন নি?

ইন্দু অন্যমনস্কের মত কহিল, না।

বিমলা জিজ্ঞাসা করিল, এখানে এসে বুঝি শুনলে?

ইন্দু তেমনিভাবে জবাব দিল, হাঁ।

বিমলা বলিতে লাগিল, আমি ত তোমাকে প্রথম দিনেই টেলিগ্রাম করতে চেয়েছিলুম; মাত্র দু-তিন ঘণ্টার পথ স্বচ্ছন্দে আসতে পারতে, কিন্তু দাদা কিছুতেই দিলেন না। হাসিয়া কহিল, কি যে তাঁকে তুমি করেচ, তা তুমিই জানো বৌ, পাছে অসুস্থ শরীরে তুমি ব্যস্ত হও, এই ভয়ে কোনমতেই খবর দিতে চাইলেন না। যাক—ঈশ্বরেচ্ছায় ভাল হয়ে গেছে—নইলে—

নইলে তার কি হ'তো ঠাকুরঝি? অসুখ সারতেও আমাকে দরকার হয়নি, না সারলেও হয়ত দরকার হ'তো না। বলিয়া ইন্দু উঠিয়া গিয়া, ঔষধের শূন্য এবং অর্ধশূন্য শিশিগুলা নাড়িয়া চাড়িয়া লেবেলের লেখা পড়িয়া দেখিতে লাগিল।

কিন্তু এ কি হইল? কখনও যাহা হয় নাই—আজ অকস্মাৎ তাহার দুই চোখ অশ্রুতে ঝাপসা হইয়া গেল। কেন, সে কি কেহ নয় যে, এতবড় একটা কাণ্ড হইয়া গেল, অথচ তাহাকে জানানো পর্যন্ত হইল না! সে নিজের এমন কি পীড়ার কথা লিখিয়াছিল যাহাতে সংবাদ দেওয়াটাও কেহ উচিত মনে করিলেন না!

তিনি ভাল হইয়াও ত কতকগুলা পত্রে কত কথা লিখিলেন, শুধু নিজের কথাটাই বলিতে ভুলিলেন? বেশ, এখানে আসিয়াও ত তিন দিন হইল, তবু কি মনে পড়িল না?

ইন্দুর তীব্র অভিমানের সুর বিমলা টের পাইয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া বলিল, শিশিবোতল নাড়াচাড়া করে আর কি হবে বৌ, ওরা কখনও মিথ্যে সাক্ষী দেবে না, তা যতই জেরা কর না। এসো, তোমার চা দেওয়া হয়েচে।

চল, বলিয়া ইন্দু অলক্ষে চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

চা খাওয়া শেষ হইলে, বিমলা কি জানি ইচ্ছা করিয়া আঘাত দিল কি না—কহিল, সে এক হাসির কথা বৌ। এক বাড়িতে দুই রোগী, কিন্তু দুজনের কি আশ্চর্য ভিন্ন ব্যবস্থা। দাদা মর মর হয়েও তোমাকে খবর দিতে দিলেন না; পাছে ব্যস্ত হও—পাছে তোমার শরীর খারাপ হয়—আর অম্বিকাবাবু একদণ্ডও ওঁর স্ত্রীকে সুমুখ থেকে নড়তে দিলেন না। তাঁর ভয়, সে চোখের সুমুখ থেকে গেলেই তাঁর প্রাণটা বেরিয়ে যাবে! এমন কি, সে ছাড়া তিনি কারও হাতে বিশ্বাস করে ওষুধ খেতেন না—এমন কখনও শুনেচ বল। আমাদের এঁকে তোমরা সবাই তামাশা কর, কিন্তু অম্বিকাবাবুরা সকলকে ডিঙিয়ে গেছেন; খেটে খেটে এই মেয়েটির ঠিক মড়ার মত আকৃতি হয়েছে।

ইন্দু 'হুঁ', বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, আর একদিন এসে তোমার সতী-সাধ্বী বৌটির সঙ্গে আলাপ করে যাব—আজ গাড়ি এসেচে, চললুম।

তা হলে কাল একবার এসো। আলাপ করে বাস্তবিক সুখী হবে।

দেখা যাবে যদি কিছু শিখতে পারি, বলিয়া ইন্দু মুখ ভার করিয়া গাড়িতে গিয়া উঠিল। অম্বিকাবাবুর পাগলামি তাহার মনের মধ্যে আজ সমস্ত পথটা তাহার স্বামীর গভীর মঙ্গলেচ্ছার গায়ে ধূলা ছিটাইয়া লজ্জা দিতে দিতে চলিল।

.

পাঁচ

দিন-দুই পরে কথায় কথায় ইন্দু অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, যদি সত্যি কথা শুনলে রাগ না কর, তা হলে বলি ঠাকুরঝি, বিয়ে করা তোমার দাদারও উচিত হয়নি, এই অম্বিকাবাবুরও হয়নি।

বিমলা জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

কারণ, প্রতিপালন করবার ক্ষমতা না থাকলে এটা মহাপাপ।

উত্তর শুনিয়া বিমলা মর্মাহত হইল। ইন্দুকে সে ভালবাসিত। খানিক পরে কহিল, অম্বিকাবাবুর অন্যায় হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তাই বলে তাঁর স্ত্রী নিজের কর্তব্য করবে না? তাকে ত মরণ পর্যন্ত স্বামীসেবা করতে হবে?

কেন হবে! তিনি অন্যায় করবেন, যাতে অধিকার নেই তাই করবেন—তার ফলভোগ করবো আমরা? তুমি ইংরিজি পড়নি, আর পাঁচটা সভ্য-সমাজের খবর রাখ না; নইলে বুঝিয়ে দিতে পারতুম, কর্তব্য শুধু একদিকে থাকে না। হয় দু'দিকে থাকবে, না হয় থাকবে না। পুরুষেরা এ কথা আমাদের বুঝতে দেয় না; দেয় না বলেই আমরা অম্বিকাবাবুর স্ত্রীর মত মৃত্যুপণ করে সেবা করি।

বিমলা মুহূর্তকাল চাহিয়া কহিল, না হলে করতাম না! বৌ, সেবা করাটা কি স্ত্রীর বড় দুঃখের কাজ বলে মনে কর? অম্বিকাবাবুর স্ত্রীর বাইরের ক্লেশটাই দেখতে পাও, তার ভেতরের আনন্দটা জানতে পাও কি?

আমি জানতেও চাইনে।

স্বামীর ভালবাসাটাও বোধ করি জানতে চাও না?

না ঠাকুরঝি, অরুচি হয়ে গেছে। বরং ওটা কম করে নিজের কর্তব্যটা করলেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

বিমলা দাঁড়াইয়াছিল, নিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িয়া বলিল, ঠিক এই কথাটাও আগেও একবার বলেচ। কিন্তু তখনও বুঝতে পারিনি, এখনও বুঝতে পারলুম না; আমার দাদা তার কর্তব্য করেন না! কি সে, তা তুমিই জানো। অনেক বই পড়েচ, অনেক দেশের খবর জানো—তোমার সঙ্গে তর্ক করা সাজে না। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস স্বামী ন্যায়-অন্যায় যাই করুন, তাঁর ভালবাসা অগ্রাহ্য করবার স্পর্ধা কোন দেশের স্ত্রীরই নেই। আমার ত মনে হয়, ও জিনিস হারানোর চেয়ে মরণ ভাল; তার পরেও বেঁচে থাকা শুধু বিড়ম্বনা।

আমি তা মানিনে।

মানো নিশ্চয়ই, বলিয়া বিমলা হাসিয়া ফেলিল। তাহার সহসা মনে হইল, এ সমস্তই পরিহাস। সত্যই ত পরিহাস ভিন্ন নারীর মুখে ইহা আর কি হইতে পারে! কহিল, কিন্তু তাও বলি বৌ, আমার কাছে যা মুখে আসে বলচ, কিন্তু দাদার সামনে এ-সব নিয়ে বেশি চালাকি ক'রো না। কেন না, পুরুষমানুষ যতই বুদ্ধিমান হোন, অনেক সময়ে—

কি—অনেক সময়ে?

তামাশা কি না, ধরতে পারে না।

সে তাঁর কাজ। আমি তা নিয়ে দুর্ভাবনা করিনে।

কিন্তু আমি যে না ভেবে থাকতে পারিনে বৌ।

ইন্দু জোর করিয়া হাসিয়া প্রশ্ন করিল, কেন বল ত?

বিমলা একটুখানি ভাবিয়া বলিল, রাগ ক'রো না বৌ; কিন্তু সেই অসুখের সময় আমার সত্যিই মনে হয়েছিল, দাদা যে তোমাকে পাবার জন্যে একসময় পাগল হয়ে উঠেছিলেন, সেই যে কি বলে 'পায়ে কাঁটা ফুটলে বুক পেতে দেওয়া'—কিন্তু সে ভাব আর বুঝি নেই।

হঠাৎ ইন্দুর সমস্ত মুখের উপর কে যেন কালি লেপিয়া দিল। তারপরে, সে জোর করিয়া শুকনো হাসি টানিয়া আনিয়া কহিল, তোমাকে সহস্র ধন্যবাদ ঠাকুরঝি, তোমার দাদাকে ব'লো, আমি ভ্রূক্ষেপও করিনে। আর তুমিও ভাল করে বুঝো, আমার নিজের ভালমন্দ নিজেই সামলাতে জানি। তা নিয়ে পরের মাথা গরম করাটাও আবশ্যক মনে করিনে।

ফিরিয়া আসিয়া ইন্দু স্বামীর ঘরে ঢুকিয়াই প্রশ্ন করিল, আমি মেদিনীপুরে গেলে তোমার ব্যামো হয়েছিল?

নরেন্দ্র খাতা হইতে মুখ তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিল, না, ব্যামো নয়—সেই ব্যাথাটা।

খরচ বাঁচাবার জন্যে ঠাকুরঝির ওখানে গিয়ে পড়েছিলে?

স্ত্রীর এই অত্যন্ত কটু ইঙ্গিতে নরেন্দ্র খাতাটার উপর পুনর্বার ঝুঁকিয়া পড়িয়া, কয়েক মুহূর্ত মৌন থাকিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, বিমল এসে নিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু আমি শুনতে পেলে বলে দিতুম, অক্ষমদের জন্যই হাসপাতাল সৃষ্টি হয়েচে। পরের ঘাড়ে না চড়ে সেইখানে যাওয়াই তাদের উচিত।

নরেন্দ্র আর মুখ তুলিল না—একটি কথাও কহিল না।

ইন্দু টান মারিয়া পর্দাটা সরাইয়া বাহির হইয়া গেল। ধাক্কা লাগিয়া একটা ক্ষুদ্র টিপাই ফুলদানি-সমেত উলটাইয়া পড়িল; সে ফিরিয়াও চাহিল না।

মিনিট-পাঁচেক পরে, তেমনি সজোরে পর্দা সরাইয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিল, ঠাকুরঝি খবর দিতে চেয়েছিলেন, তুমি মানা করেছিলে কি জন্যে? ভেবেছিলে বুঝি আমি এসে ওষুধের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দেব!

নরেন্দ্র মুখ না তুলিয়াই বলিল, না, তা ভাবিনি। তোমার শরীর ভাল ছিল না—

ভালই ছিল। যদিও খবর পেলেও আমি আসতুম না, সে নিশ্চয়। কিন্তু, আমি সেখানে যে, রোগে মরে যাচ্ছিলাম, এ কথাও তোমাকে চিঠিতে লিখিনি। অনর্থক কতকগুলো মিথ্যে কথা বলে ঠাকুরঝিকে নিষেধ করবার হেতু ছিল না। বলিয়া সে যেমন করিয়া আসিয়াছিল, তেমনি করিয়া চলিয়া গেল। নরেন্দ্রও তেমনি করিয়া খাতাটার পানে ঝুঁকিয়া রহিল, কিন্তু সমস্ত লেখা তাহার লেপিয়া মুছিয়া চোখের সুমুখে একাকার হইয়া রহিল।

ইন্দু পর্দার অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া ডাক্তারকে কহিল, আপনিই গগনবাবুর বাড়িতে আমার স্বামীর চিকিৎসা করেছিলেন?

বুড়া ডাক্তার চোখ তুলিয়া ইন্দুর উদ্বেগ-মলিন মুখখানির পানে চাহিয়া, ঘাড় নাড়িয়া সায় দিলেন।

ইন্দু কহিল, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়েছেন বলে আমার মনে হয় না। এই আপনার ফি-র টাকা—আজ একবার ওবেলা যদি দয়া করে বন্ধুভাবে এসে তাঁকে দেখে যান বড় উপকার হয়।

ডাক্তার কিছু বিস্মিত হইলেন।

ইন্দু বুঝাইয়া বলিল, ওঁর স্বভাব চিকিৎসা করতে চান না। ওষুধের প্রেস্‌ক্রিপসনটা আমাকে লুকিয়ে দেবেন। তাঁকে একটু বুঝিয়ে বলবেন।

ডাক্তার সম্মত হইয়া বিদায় লইলেন।

রামটহল আসিয়া সংবাদ দিল, মাজী, বল্লভ সেকরা এসেছে।

এসেচে? এদিকে ডেকে আন।

ও বল্লভ, একটু কাজের জন্য তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলুম, তুমি আমাদের বিশ্বাসী লোক—এই চুড়ি ক'গাছা বিক্রি করে দিতে হবে। বড় পুরানো ধরনের চুড়ি বাপু, আর পরা যায় না। এ দামে নতুন একজোড়া কিনবো মনে কচ্চি।

বেশ ত মা, বিক্রি করে দেব।

নিক্তি এনেচ ত? ওজন করে দেখ দেখি কত আছে? দামটা কিন্তু বাপু আমাকে কালই দিতে হবে। আমার দেরি হলে চলবে না।

তাই দেব।

বল্লভ চুড়ি হাতে করিয়া বলিল, এ যে একেবারে টাটকা জিনিস মা। বেচলেই ত কিছু লোকসান হবে।

তা হোক বল্লভ। এ গড়নটা আমার মনে ধরে না। আর এ সম্বন্ধে বাবুকে কোনও কথা ব'লো না।

বাবুদের লুকাইয়া অলঙ্কার বেচা-কেনার ইতিহাস বল্লভের অবিদিত ছিল না। সে একটু হাসিয়া চুড়ি লইয়া গেল।

.

ছয়

ডাক্তারবাবু, পাঁচ-সাত শিশি ওষুধ খেলেন, কিন্তু বুকের ব্যথাটা ত গেল না।

গেল না? কৈ, তিনি ত কিছু বলেন না?

জানেন ত, ঐ তাঁর স্বভাব; কিন্তু, আমি নিশ্চয় জানি, একটু ব্যথা লেগেই আছে—তা ছাড়া, শরীর ত সারচে না!

ডাক্তার চিন্তা করিয়া কহিলেন, দেখুন আমারও সন্দেহ হয়, শুধু ওষুধে কিছু হবে না। একবার জল-হাওয়া পরিবর্তন আবশ্যক।

তাই কেন তাঁকে বলেন না?

বলেছিলাম একদিন। তিনি কিন্তু প্রয়োজন মনে করেন না।

ইন্দু রুষ্ট হইয়া বলিয়া ফেলিল, তিনি মনে না করলেই হবে? আপনি ডাক্তার, আপনি যা বলবেন, তাই ত হওয়া চাই।

বৃদ্ধ চিকিৎসক একটুখানি হাসিলেন।

ইন্দু নিজের উত্তেজনায় লজ্জিত হইয়া বলিল, দেখুন আমি বড় ব্যাকুল হয়ে পড়েচি। আপনি ওঁকে খুব ভয় দেখিয়ে দিন।

ডাক্তার মাথা নাড়িয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, এ-সকল রোগে ভয় ত আছেই।

ইন্দুর মুখ পাংশু হইয়া গেল, কহিল, সত্যি ভয় আছে?

তাহার মুখের পানে চাহিয়া ডাক্তার সহসা জবাব দিতে পারিল না।

ইন্দুর চোখে জল আসিয়া পড়িল, বলিল, আমি আপনার মেয়ের মত ডাক্তারবাবু, আমাকে লুকোবেন না। কি হয়েচে, খুলে বলুন।

ঠিক যে কি হইয়াছে তাহা ডাক্তার নিজেও জানিতেন না। তিনি নানা রকম করিয়া যাহা কহিলেন, তাহাতে ইন্দুর ভয় ঘুচিল না। সে ঘরে ফিরিয়া আসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বিকেলবেলা নরেন্দ্র হাতের কলমটা রাখিয়া দিয়া খোলা জানালার বাহিরে চাহিয়া ছিল, ইন্দু ঘরে ঢুকিয়া অদূরে একটা চৌকি টানিয়া লইয়া বসিল। নরেন্দ্র একবার মুখ ফিরাইয়া, আবার সেইদিকেই চাহিয়া রহিল।

কিছুদিন হইতে ইন্দু টাকা চাহে নাই; আজ সে যে কিজন্য আসিয়া বসিল, তাহা নিশ্চয় অনুমান করিয়া তাহার বুকের ভিতরটা টিপটিপ করিতে লাগিল।

ইন্দু টাকা চাহিল না; কহিল, ডাক্তারবাবু বলেন ব্যথাটা যখন ওষুধে যাচ্ছে না, তখন হাওয়া বদলানো দরকার। একবার কেন বেড়াতে যাও না।

নরেন্দ্র বাস্তবিক চমকিয়া উঠিল। বহুদিন অজ্ঞাত বড় স্নেহের ধন যেন কোথায় লুকাইয়া তাহাকে ডাক দিল। ইন্দুর এই কণ্ঠস্বর সে ত ভুলিয়াই গিয়াছিল। তাই মুখ ফিরাইয়া হতবুদ্ধির মত চাহিয়া ক্ষণকালের জন্য কি যেন মনে মনে খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল।

ইন্দু কহিল, কি বল? তা হলে কালই গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়া যাক। বেশি দূরে কাজ নেই—এই বদ্যিনাথের কাছে—আমরা দু' জন, কমলা আর ঝি—রামটহল পুরানো বিশ্বাসী লোক, বাড়িতেই থাক। সেখানে একটা ছোট বাড়ি নিলেই হবে। তাহলে আজ থেকে গুছোতে আরম্ভ করুক না কেন?

কোন প্রকার খরচের কথাতেই নরেন্দ্র ভয় পাইত। এই একটা বড় রকমের ইঙ্গিতে তাহার মেজাজ একেবারে বিগড়াইয়া গেল। প্রশ্ন করিল, এই ডাক্তারটিকে এখানে আসতে বললে কে?

ইন্দু জবাব দিবার পূর্বে সে পুনরায় কহিল, বিমলাকে ব'লো আমার পিছনে ডাক্তার লাগিয়ে উত্যক্ত করবার আবশ্যক নেই; আমি ভাল আছি।

বিমলা প্রচ্ছন্ন থাকিয়া ডাক্তার পাঠাইতেছে,—বিমলাই সব। ইন্দু অন্তরে আঘাত পাইল। কিন্তু চাপা দিয়া বলিল, কিন্তু তুমি ত সত্যই ভাল নেই। ব্যথাটা ত সারেনি।

সেরেচে।

তা হলেও শরীর সারেনি—বেশ দেখতে পাচ্ছি। একবার ঘুরে এলে, আর যাই হোক—মন্দ কিছু ত হবে না।

নরেন্দ্র ভিতরে-বাহিরে এমন জায়গায় উপস্থিত হইয়াছিল, যেখানে সহ্য করিবার ক্ষমতা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। তবুও ধাক্কা সামলাইয়া বলিল, আমার ঘুরে বেড়াবার সামর্থ্য নেই।

ইন্দু জিদ করিয়া বলিল, সে হবে না। প্রাণটা ত বাঁচানো চাই।

এই জিদটা ইন্দুর পক্ষে এতই নূতন যে, নরেন্দ্র সম্পূর্ণ ভুল করিল। তাহার নিশ্চয়ই মনে হইল, তাহাকে ক্লেশ দিবার ইহা একটা অভিনব কৌশল মাত্র। এতদিনের ধৈর্যের বাঁধন তাহার নিমেষে ছিন্ন হইয়া গেল। চেঁচাইয়া উঠিল, কে বললে প্রাণ বাঁচানো চাই? না, চাই না। তোমার পায়ে পড়ি ইন্দু, আমাকে রেহাই দাও, আমি নিশ্বাস ফেলে বাঁচি।

স্বামীর কাছে কটু কথা শোনা ইন্দু কল্পনা করিতেও পারিত না। সে কেমন যেন জড়সড় হতবুদ্ধি হইয়া গেল। কিন্তু নরেন্দ্র জানিতে পারিল না; বলিতে লাগিল, তুমি ঠিক জানো, আমি কি সঙ্কটের মাঝখানে দিন কাটাচ্চি। সমস্ত জেনেশুনেও আমাকে কেবল কষ্ট দেবার জন্যেই অহর্নিশি খোঁচাচ্চ। কেন, কি করেচি তোমার? কি চাও তুমি?

ইন্দু ভয়ে বিবর্ণ হইয়া চাহিয়া রহিল। একটা কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

চেঁচামেচি উত্তেজনা নরেন্দ্রর পক্ষে যে কিরূপ অস্বাভাবিক, তাহা এইবার সে নিজেই টের পাইল। কণ্ঠস্বর নত করিয়া বলিল, বেশ, স্বীকার করলুম আমার হাওয়া বদলানো আবশ্যক, কিন্তু কি করে যাব? কোথায় টাকা পাব? সংসার-খরচ যোগাতেই যে আমার প্রাণ বার হয়ে যাচ্চে।

ইন্দু নিজে কোনও দিন ধৈর্য শিক্ষা করে নাই; অবনত হইতে তাহার মাথা কাটা যাইত। আজ কিন্তু সে ভয় পাইয়াছিল। নম্রকণ্ঠে কহিল, টাকা নেই বটে, কিন্তু অনেক টাকার গয়না ত আমাদের আছে–

আছে, কিন্তু আমাদের নেই, তোমার আছে। তোমার বাবা দিয়েচেন–তোমাকে। আমার তাতে একবিন্দুও অধিকার নেই–এ কথা আমার চেয়ে তুমি নিজেই ঢের বেশি জানো।

বেশ, তা না নাও–আমি নগদ টাকা দিচ্চি।

কোথায় পেলে? সংসার-খরচ থেকে বাঁচিয়েচ?

ইহা চুড়ি বিক্রির টাকা। ইন্দু সহজে মিথ্যা কহিতে পারিত না। ইহাতে তাহার বড় অপমান বোধ হইত। আজ কিন্তু সে মিথ্যা বলিল। নরেন্দ্র মুখের ভাব ভয়ানক কঠিন হইল। ধীরে ধীরে বলিল, তা হলে রেখে দাও, গয়না গড়িয়ো। আমার বুকের অনেক রক্ত জল করে যা জমা হয়েচে, তা এভাবে নষ্ট হতে পারে না। ইন্দু, কখনও তোমাকে কটু কথা বলিনি, চিরদিনই শুনে আসচি। কিন্তু তুমি না সেদিন দম্ভ করে বলেছিলে, কখনও মিথ্যে বল না? ছিঃ–

কমলা পর্দা ফাঁক করিয়া ডাকিল, মা, পিসিমা এসেচেন।

কি হচ্চে গো বৌ? বলিয়া বিমলা ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল। ইন্দু মেয়েকে আনিয়া, তাহার গলার হারটা দুই হাতে সজোরে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, স্বামীর মুখের সামনে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল, মিথ্যে বলতে আমি জানতাম না–তোমার কাছেই শিখেচি। তবুও এখনও পেতলকে সোনা বলে চালাতে শিখিনি। যে স্ত্রীকে ঠকায়, নিজের মেয়েকে ঠকায়, তার আর কি বাকি থাকে! সে অপরকে মিথ্যাবাদী বলে কি করে?

নরেন্দ্র ছিন্ন হারটা তুলিয়া প্রশ্ন করিল, কি করে জানলে পেতল? যাচাই করিয়েচ?

তোমার বোনকে যাচাই করে দেখতে বল। বলিয়া সে দুই চোখ রাঙ্গা করিয়া বিমলার দিকে চাহিল।

বিমলা দু' পা পিছাইয়া গিয়া বলিল, ও-কাজ আমার নয় বৌ, আমি এত ইতর নই যে, দাদার দেওয়া গয়না সেকরা ডেকে যাচাই করে দেখব।

নরেন্দ্র কহিল, ইন্দু, তোমাকেও দু-একখানা গয়না দিয়েচি, সে যাচাই করে দেখেচ?

দেখিনি, কিন্তু এবার দেখতে হবে।

দেখো, সেগুলো পেতল নয়।

ভগিনীর মুখের পানে চাহিয়া হারটা দেখাইয়া কহিল, এটা সোনা নয় বোন, পেতলই বটে। যে দুঃখে বাপ হয়ে ঐ একটি মেয়ের জন্মদিনে তাকে ঠকিয়েচি সে তুই বুঝবি। তবুও, মেয়েকে ঠকাতে পেরেচি, কিন্তু নিজের স্ত্রীকে ঠকাতে সাহস করিনি।

.

সাত

কথা শোনো বৌ, একবার পায়ে হাত দিয়ে তাঁর ক্ষমা চাও গে।

কেন, কি দুঃখে? আমার মাথা কেটে ফেললেও আমি তা পারব না ঠাকুরঝি।

কেন পারবে না? স্বামীর পায়ে হাত দিতে লজ্জা কি? বেশ ত, তোমার দোষ না হয় নেই, কিন্তু তাঁকে প্রসন্ন করা যে সকল কাজের বড়।

না—আমার তা নয়। ভগবানের কাছে খাঁটি থাকাই আমার সকল কাজের বড়। যতক্ষণ সে অপরাধ না করচি, ততক্ষণ আর কিছুই ভয় করিনে।

বিমল রাগিয়া বলিল, বৌ, এ- সব পাকামির কথা আমরাও জানি, তখন কিছুই কোন কাজে আসবে না বলে দিচ্চি। চোখ বুজে বিপদ এড়ানো যায় না। দাদা সত্যই তোমার ওপর বিরক্ত হয়ে উঠচেন।

ইন্দু উদাসভাবে বলিল, তাঁর ইচ্ছে।

বিমলা মনে মনে অত্যন্ত জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, সেই ইচ্ছে টের পাবে, যেদিন সর্বনাশ হবে। দাদা যেমন নিরীহ, তেমনি কঠিন। তাঁর এ-দিক দেখেচ, ও-দিক দেখতে এখনো বাকি আছে—তা বলে দিচ্চি।

আচ্ছা, দেখতে পেলে তোমাকে খবর দিয়ে আসব।

বিমলা আর কিছু বলিল না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বলিল, তা সত্যি। বিশ্বাস হয় না বটে, স্বামীর স্নেহে বঞ্চিত হবো। কিন্তু সে-মানুষ যে দাদা নয়—অসুখের সময় তাঁকে ভাল করে চিনেচি। বুকের কপাট তার একবার বন্ধ হয়ে গেলে আর খোলা যাবে না।

একবার ইন্দুও মুখ গম্ভীর করিল। কহিল, খোলা না পাই, বাইরেই থাকব। খুলে দেবার জন্য তাঁর পায় ধরেও সাধব না—তোমাকেও সুপারিশ করতে ডাকব না। ও কি রাগ করে চললে না কি?

বিমলা দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল, রাগ নয়—দুঃখ করে যাচ্ছি। বৌ, নিজের বোনের চেয়েও তোমাকে বেশি ভালবেসেচি বলেই প্রাণটা কেঁদে কেঁদে ওঠে। দাদা যে অমন করে বলতে পারেন, আমি চোখে দেখে না গেলে বিশ্বাসই করতুম না!

ইন্দু হঠাৎ একটু হাসিয়া বলিল, অত বক্তৃতা আর কখনো তাঁর মুখে শুনবে না।

বক্তৃতা তুমিও কিছু কম করনি বৌ। তবে তিনি যে আর কখন করবেন না, তা আমারও মনে হয়। এক কথা এক শ'বার বলবার লোক তিনি নন।

ইন্দু আবার হাসিয়া বলিল, সেও বটে,—তবে আর একটা গুরুতর কারণ ঘটেচে, যাতে আর কোনদিন স্বপ্নেও চোখ রাঙ্গাতে সাহস করবেন না। আমার বাবার চিঠি পেলুম।

তিনি আমার নামে দশ হাজার টাকা উইল করে দিয়েছেন। কি বল ঠাকুরঝি, পায়ে ধরবার আর দরকার আছে বলে মনে হয়?

বিমলার মুখ যেন আরও অন্ধকার হইয়া গেল। বলিল, বৌ, এর পূর্বে কখনো তোমাকে তিনি চোখ রাঙ্গাননি। যা করে তাঁকে ফেলে রেখে তুমি মেদিনীপুরে গিয়াছিলে, সে আমি ত জানি; কিন্তু তবুও কোনোদিন এতটুকু তোমার নিন্দে করেন নি। হাসিমুখে তোমার সমস্ত দোষ আমার কাছেও ঢেকে রেখেছিলেন—সে কি তোমার টাকার লোভে? বৌ, শ্রদ্ধা ছাড়া ভালবাসা থাকে না। যে জিনিস তুমি তেজ করে হেলায় হারাচ্চো—সেদিন টের পাবে যেদিন যথার্থই হারাবে। কিন্তু এই একটা কথা আমার মনে রেখো বৌ, আমার দাদা অত নীচ নয়। আর না, সন্ধ্যা হয়—চললুম; কাল-পরশু একবার সময় হলে আমাদের বাড়ি এসো।

আচ্ছা! বলিয়া ইন্দু পিছনে পিছনে সদর দরজা পর্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার মৃদু পদশব্দ বিমলা যে শুনিয়াও শুনিল না, তাহা সে বুঝিল। গাড়িতে উঠিয়া বসিলে মুখ

বাড়াইয়া চিরদিন এই দুটি সখী পরস্পরকে নিমন্ত্রণ করিয়া, হাসিয়া কপাট বন্ধ করে। আজ গাড়িতে ঢুকিয়াই বিমলা দরজা টানিয়া দিল।

ঘরে ফিরিয়া আসিয়া ইন্দু কমলাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া শুইয়া পড়িল।

বিমলা চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার খরতপ্ত কথাগুলা রাখিয়া গেল। ইহার উত্তাপ যে কত, এইবার ইন্দু টের পাইল। এই তাপে তাহার অহঙ্কারের অভ্রভেদী তুষারস্তূপ যতই গলিয়া বহিয়া যাইতে লাগিল, ততই এক-একটি নূতন বস্তু তাহার চোখে পড়িতে লাগিল। এত কাদামাটি—আবর্জনা—এত কর্কশ-কঠিন শিলাখণ্ড যে এই ঘনীভূত জলতলে আবৃত হইয়াছিল, তাহা সে ত স্বপ্নেও ভাবে নাই!

হঠাৎ তাহার অন্তরের ভিতর হইতে কে যেন জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল, এ কেমন হয় ইন্দু, যদি তিনি মনে মনে তোমাকে ত্যাগ করেন ? তুমি কাছে গিয়ে বসলেও যদি তিনি ঘৃণায় সরে বসেন?

তাহার সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া উঠিল।

কমলা কহিল, কি মা?

ইন্দু তাহাকে সজোরে বুকে চাপিয়া ধরিয়া, তাহার মুখে চুমা খাইয়া বলিল, তোর পিসিমা এত ভয় দেখাতেও পারে!

কিসের ভয়, মা?

ইন্দু আর একটি চুমা খাইয়া বলিল, কিছু না মা, সব মিথ্যে—সব মিথ্যে। যা ত মা, দেখে আয় ত তোর বাবা কি কচ্চেন?

মেয়ে ছুটিয়া চলিয়া গেল। আজ দু'দিন স্বামী-স্ত্রীতে একটা কথাও হয় নাই। কমলা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, বাবা চুপ করে শুয়ে আছেন।

চুপ করে? আচ্ছা, তুই শুয়ে থাক মা, আমি দেখে আসি, বলিয়া ইন্দু নিজে চলিয়া গেল। পর্দার ফাঁক দিয়া দেখিল, তাই বটে। তিনি উপরের দিকে চাহিয়া সোফায় শুইয়া আছেন। মিনিট পাঁচ-ছয় দাঁড়াইয়া দেখিয়া ইন্দু ফিরিয়া আসিল। আজ প্রবেশ করিতে সাহস হইল না দেখিয়া সে নিজেই ভারি আশ্চর্য হইয়া গেল।

কমলা!

কি মা?

তোর বাবার বোধ হয় খুব মাথা ধরেছে। যা মা, বসে বসে একটু মাথায় হাত বুলিয়ে দে গে।

মেয়েকে পাঠাইয়া দিয়া ইন্দু নিজে আড়ালে দাঁড়াইয়া উদ্‌গ্রীব হইয়া দুজনের কথাবার্তা শুনিতে লাগিল।

কন্যা প্রশ্ন করিল, কেন এত মাথা ধরেচে বাবা?

পিতা উত্তর দিলেন, কৈ ধরেনি ত মা!

কন্যা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, মা বললেন যে খুব ধরেচে?

পিতা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কন্যার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। একটু পরে বলিলেন, তোমার মা জানে না।

পর্দা ঠেলিয়া ইন্দু সহজভাবে ঘরে ঢুকিল। টেবিলের আলোটা কমাইয়া দিয়া কহিল, রোগা শরীরে এত পরিশ্রম কি সহ্য হয়? যা ত মা কমলা, ও-ঘর থেকে ওডিকোলনের শিশিটা নিয়ে আয়—আর রামটহলকে একটু বরফ কিনে আনতে বলে দে।

মেয়েকে তুলিয়া দিয়া শিয়রে আসিয়া বসিল। চুলের মধ্যে হাত দিয়া বলিল, আগুন উঠছে যেন।

নরেন্দ্র চোখ বুজিয়া রহিল—কিছুই বলিল না। ইন্দু নীরবে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে ঈষৎ ঝুঁকিয়া সস্নেহ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আজ বুকের ব্যথাটা কেমন আছে?

তেমনি।

তবে এই যে রাগ করে দু'দিন ওষুধ খেলে না, বেড়ে গেলে কি হবে বল ত?

নরেন্দ্র চোখ মেলিয়া শ্রান্তকণ্ঠে বলিল, আমার শরীরটা ভাল নেই—একটু চুপ করে থাকতে চাই ইন্দু।

এই কথার এই জবাব!

ইন্দু তড়িৎবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, তাই থাকো। আমার ঘাট হয়েচে তোমার ঘরে ঢুকেছিলুম।

দ্বারের কাছে আসিয়া হঠাৎ দাঁড়াইয়া বলিল, নিজের প্রাণটা নষ্ট করে আমাকে শাস্তি দিতে পারবে না। এই চিঠিখানা পড়ে দেখ, বাবা আমাকে দশ হাজার টাকা উইল করে দিয়েছেন। বলিয়া বাঁ হাতের চিঠিটা সোফার দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তার পর মুখে আঁচল গুঁজিয়া কান্না চাপিতে চাপিতে নিজের ঘরে ঢুকিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল।

কথা সহিতে, হার মানিতে সে শিখে নাই—অনেক নারীই শিখে না—তাই আজ তাহার সমস্ত সাধু-সঙ্কল্পই ব্যর্থ হইয়া গেল। সে কি করিতে গিয়া কি করিয়া ফিরিয়া আসিল।

.

আট

ও কি ঠাকুরঝি,—তোমরা কাঁদছিলে নাকি? চোখ দুটি তোমাদের যে জবাফুল হয়েচে?

অম্বিকাবাবুর স্ত্রী শুনিতেছিলেন এবং বিমলা উপুড় হইয়া বই পড়িতেছিল; ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া চোখ মুছিয়া হাসিল,—উঃ! দুর্গামণির দুঃখে বুক ফেটে যায় বৌ!

ইন্দু জিজ্ঞাসা করিল, কে দুর্গামণি?

ন্যাকা সেজো না বৌ। জানো না কে দুর্গামণি? চারিদিকে যে এত সুখ্যাতি বেরিয়েচে তা ঠিক বটে।

ইন্দু আর কিছুই বুঝিল না, শুধু বুঝিল একখানা বইয়ের কথা হইতেছে। হাত বাড়াইয়া কহিল, দেখি বইটা।

হাতে লইয়া উপরেই দেখিল গ্রন্থকার—তাহার স্বামীর নাম লেখা। পাতা উলটাইতেই চোখে পড়িল উৎসর্গ করা হইয়াছে বিমলাকে। ইন্দু বইখানা আগাগোড়া নাড়িয়া চাড়িয়া রাখিয়া দিল। লেখা হইয়াছে, ছাপা হইয়াছে, দেওয়া হইয়াছে—অথচ সে তাহার বিন্দু বিসর্গও জানে না। তাহার মুখের চেহারা দেখিয়া বিমলা আর একটা প্রশ্ন করিতেও সাহস করিল না। তখন ইন্দু নিজেই বলিল, আমার নাটক-নভেল পড়তে ইচ্ছাও করে না। ভাল লাগে না। যা হোক, ভাল হয়েচে শুনে সুখী হলুম।

অম্বিকাবাবুর চাকর আসিয়া তাঁহার স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, বাবু জিজ্ঞেস কচ্চেন, আজ তাঁর যে যাদুঘর দেখতে যাবার কথা ছিল—যাবেন?

এই বধূটি সকলের চেয়ে ছোট; সে লজ্জা পাইয়া ঘাড় হেঁট করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, না, তাঁর শরীর এখনো তেমন সারেনি—আজ যেতে হবে না।

চাকর চলিয়া গেল, ইন্দু হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। তাহার মনে হইল এমন আশ্চর্য কথা সে জীবনে শোনে নাই।

ভোলা আসিয়া বিমলাকে জিজ্ঞাসা করিল, বাবু অফিস থেকে জানতে লোক পাঠিয়েছেন—একটা বড় আলমারি-দেরাজ নীলাম হচ্ছে! বড় ঘরের জন্য কেনা হবে কি?

বিমলা কহিল, না, কিনতে মানা করে দে। একটা ছোট বুককেস হলেই ও-ঘরের হবে।

ভোলা চলিয়া গেল। ইন্দু মহাবিস্ময়ে অবাক হইয়া বসিয়া রহিল। এই স্বামীদের প্রশ্নগুলোতেও সে বেশি প্রভুত্ব দেখিতে পাইল না, ইঁহাদের স্ত্রী-দুটির আদেশগুলাও তাহার কাছে ঠিক দাসীদের মত শুনাইল না। অথচ, তাহার নিজের মনের মধ্যে কেমন যেন একটা ব্যথা বাজিতে লাগিল। কেবলই মনে হইতে লাগিল, কি করিয়া যেন ইহাদের কাছে সে একেবারে ছোট হইয়া গিয়াছে।

যাইবার সময় বিমলা চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, বৌ, সত্যি কি তুমি দাদার এই বইটার কথা জানতে না?

ইন্দু তাচ্ছিল্যের সহিত কহিল, না। আমার ও-জন্যে মাথাব্যথা করে না। সারাদিন বসেই ত লিখচে—কে অত খোঁজ করে বল? ভাল কথা ঠাকুরঝি, কাল বাপের বাড়ি যাচ্চি।

বিমলা উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল, না, বৌ, যেয়ো না।

কেন?

কেন সে কি বুঝিতে বলতে হবে বৌ? দাদা তোমাকে তাঁর দুঃখের সুখের কোন ভারই দেন না—তাও কি চোখে দেখতে পাও না? স্বামীর ভালবাসা হারাচ্চ—তাও কি টের পাও না?

ইন্দু হঠাৎ রুষ্ট হইয়া বলিল, অনেকবার বলেচি তোমাকে, আমি চাইনে—চাইনে—চাইনে। আমি দাদার ওখানে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকব; ইনি আর যেন আমাকে আনতে না যান—আর যেন আমাকে জ্বালাতন না করেন।

এবার বিমলাও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। কহিল, এ-সব বড়াই পুরুষমানুষের কাছে কোরো বৌ, আমি ত মেয়েমানুষ, আমার কাছে কোরো না। তোমার বাপেরা বড়লোক, তোমার সংস্থান তাঁরা করে দিয়েছেন—এই ত তোমার অহঙ্কার? আচ্ছা, এখন যাচ্চো যাও; কিন্তু একদিন হুঁশ হবে, যা হারালে তার তুলনায় সমস্ত পৃথিবীটাও ছোট। বৌ, যা তুমি পেয়েছিলে, কম মেয়েমানুষেই তা পায়—সে জানি, কিন্তু যে অপব্যয় তুমি করলে, তাতে অক্ষয়ও ক্ষয়ে শেষ হয়ে যায়। বোধ করি গেলও তাই।

সেই বইখানা বিমলার হাতেই ছিল। তাহার প্রতি দৃষ্টি পড়ায় ইন্দুর বুকের ভিতরটা আর একবার হুহু করিয়া উঠিল। বলিল, অহঙ্কার করবার থাকলেই লোকে করে। কিন্তু, আমার সর্বনাশ হয় হবে, যায় যাবে, সেজন্যে ঠাকুরঝি তুমিই বা মাথা গরম কর কেন, আর আমিই বা যা-তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনি কেন? আমার থাকতে ইচ্ছে নেই,—থাকব না। এতে যা হয় তা হবে—কারু পরামর্শ নিতেও চাইনে, ঝগড়া করতেও চাইনে।

বিমলা মৌন হইয়া রহিল। তাহার ব্যথা অন্তর্যামী জানিলেন, কিন্তু এ অপমানের পরে আর সে তর্ক করিল না।

ইন্দু অগ্রসর হইবার উপক্রম করিতেই কহিল, দাঁড়াও ত বৌ, তুমি সম্পর্কে বড়, একটা প্রণাম করি।

.

নয়

সেদিন সন্ধ্যা হইতেই সমস্ত আকাশ ঝাঁপিয়া মেঘ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। ইন্দু মেয়ে লইয়া বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িল। আজ তার ছোট-ভগিনীপতি আসিয়াছিলেন, পাশের ঘর হইতে তাঁহাকে খাওয়ানো-দাওয়ানো গল্প-গুজবের অস্ফুট কলধ্বনি যতই ভাসিয়া আসিতে লাগিল, ততই কিসের অব্যক্ত লজ্জায় তাহার বুক ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

তিন মাস হইতে চলিল, সে মেদিনীপুরে আসিয়াছে। ছোটভগিনীও আসিয়াছে। তাহার স্বামী এই দুই মাসের মধ্যেই শান্তিপুর হইতে অন্ততঃ পাঁচ-ছয়বার আসা-যাওয়া করিলেন, কিন্তু নরেন্দ্র একটিবারও আসিলেন না, একখানা চিঠি লিখিয়াও খোঁজ করিলেন না।

কিছুদিন হইতে ব্যাপারটার উপর সকলেরই দৃষ্টি পড়িয়াছে এবং প্রায়ই আলোচনা হইতেছে। ছোট-ভগিনীপতির ঘরে সকলের সম্মুখে পাছে এই কথাটাই উঠিয়া পড়ে, এই ভয়েই ইন্দু অসময়ে পলাইয়া ঘরে ঢুকিয়াছিল।

স্বামী আসেন না। তাঁহার অবহেলায় বেদনা কত, সে ইন্দুর নিজের কথা—সে যাক। কিন্তু ইহাতে এত যে ভয়ানক লজ্জা, এ কথা সে ত একদিনও কল্পনা করে নাই। ভ্রূণহত্যা, নরহত্যার মত এ যে কেবল লুকাইয়া ফিরিতে হয়! মরিয়া গেলেও যে কাহারো কাছে স্বীকার করা যায় না, স্বামী ভালবাসেন না!

এতদিন স্বামীর ঘরে স্বামীর পাশে বসিয়া তাঁহাকে টানিয়া পিটিয়া নিজের সম্ভ্রম ও মর্যাদা বাড়াইয়া তুলিতেই সে অহরহ ব্যস্ত ছিল, কিন্তু এখন পরের ঘরে, চোখের আড়ালে সমস্তই যে ভাঙ্গিয়া ধ্বসিয়া পড়িতেছে—কি করিয়া সে খাড়া করিয়া রাখিবে?

আজ ভগিনীপতি আসার পর হইতে যে-কেহ তাহার পানে চাহিয়াছে, তাহার মনে হইয়াছে, তাহাকে করুণা করিতেছে। কমলাকে কেহ তাহার পিতার কথা জিজ্ঞাসা করিলে, ইন্দু মরমে মরিয়া যায়, বাড়ি ফিরিবার প্রশ্ন করিলে লজ্জায় মাটিতে মিশিতে চায়।

অথচ, আসিবার পূর্বে স্বামীকে সে অনেকগুলো মর্মান্তিক কথায় বলিয়া আসিয়াছিল,—প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা হইলে যেন লইয়া আসে।

হঠাৎ ইন্দুর মোহের ঘোর কাটিয়া গেল—কমলা, কাঁদছিস কেন মা?

কমলা রুদ্ধস্বরে বলিল, বাবার জন্যে মন কেমন কচ্চে!

ইন্দুর বুকের উপর যেন হাতুড়ির ঘা পড়িল, সে মেয়েকে প্রাণপণে বুকে চাপিয়া ধরিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

বাহিরের প্রবল বারিবর্ষণ তাহার লজ্জা রক্ষা করিল—কন্যা ছাড়া এ কান্না আর কেহ শুনিতে পাইল না।

তাহার জননী শিখাইয়া দিলেন কি না জানি না, পরদিন সকাল হইতেই কমলা পিতার কাছে যাইবার জন্য বায়না ধরিয়া বসিল। প্রথমে ইন্দু অনেক তর্জন-গর্জন করিয়া, শেষে দাদাকে আসিয়া কহিল, কমলা কিছুতেই থামে না—কলকাতায় যেতে চায়।

দাদা বলিলেন, থামাবার দরকার কি বোন, কাল সকালেই তাকে নিয়ে যা। কেমন আছে নরেন? সে আমাকে ত চিঠিপত্র লেখে না, তোকে লেখে ত?

ইন্দু ঘাড় হেঁট করিয়া বলিল, হুঁ।

ভাল আছে ত?

ইন্দু তেমনি করিয়া জানাইল, আছেন।

বিমলা আবাক হইয়া গেল—কখন এলে বৌ?

এই আসচি।

ভৃত্য গাড়ি হইতে ইন্দুর তোরঙ্গ নামাইয়া আনিল। বিমলা দারুণ বিরক্তি কোনমতে চাপিয়া কহিল, বাড়ি যাওনি?

না। শুধু কমলাকে সুমুখ থেকে নামিয়া দিয়ে এসেচি। শুধু তার জন্যেই আসা—নইলে আসতুম না।

বিমলা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, না এলেই ভাল করতে বৌ। ওখানে তোমার আর গিয়েও কাজ নেই।

ইন্দুর বুকের ভিতরটা ধড়াস করিয়া উঠিল—কেন ঠাকুরঝি?

বিমলা সহজ গম্ভীরভাবে কহিল, পরে শুনো। কাপড় ছাড়ো, মুখহাত ধোও—যা হবার সে ত হয়েই গেছে—এখন, আজ শুনলেও যা, দু'দিন পরে শুনলেও তাই।

ইন্দু বসিয়া পড়িল। তাহার সমস্ত মুখ নীলবর্ণ হইয়া গেল, বলিল, সে হবে না ঠাকুরঝি, না, শুনে আমি একবিন্দু জলও মুখে দেব না। তাঁকে দেখতে পেয়েচি, তিনি বেঁচে আছেন—তবুও সেখানে আমার গিয়ে কাজ নেই কেন?

বিমলা খানিক থামিয়া, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, সত্যিই ও বাড়িতে তোমার জায়গা নেই। এখন তোমার পক্ষে এখানেও যা, বাপের বাড়িতেও তাই। ও-বাড়িতে তুমি থাকতে পারবে না।

ইন্দু কান্না চাপিয়া বলিয়া উঠিল, আমি আর সইতে পারিনে ঠাকুরঝি, কি হয়েচে খুলে বল। বিয়ে করেচেন?

বিশ্বাস হয়?

না। কিছুতেই না। আমার অপরাধ যত বড়ই হোক, কিন্তু তিনি অন্যায় কিছুতে করতে পারেন না। তবুও কেন আমার তাঁর পাশে স্থান নেই, বলবে না? বলিতে বলিতে তাহার দুই চোখ বাহিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বিমলার নিজের চক্ষুও আর্দ্র হইয়া উঠিল, কিন্তু অশ্রু ঝরিল না। বলিল, বৌ, আমি ভেবে পাইনে, কি করে তোমাকে বোঝাব, সেখানে আর তোমার স্থান নেই। শম্ভুবাবু দাদাকে জেলে দিয়েছিল।

ইন্দুর সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া উঠিল—তার পরে?

বিমলা বলিল, আমরা তখন কাশীতে। শম্ভুবাবু টাকা যোগাড় করবার দু'দিন সময় দেয়। কিন্তু চার হাজার টাকা যোগাড় হয়ে ওঠে না। ধরে নিয়ে যাবার পরে দাদা ভোলাকে আমার কাছে কাশীতে পাঠিয়ে দেন, কিন্তু আমরা তখন এলাহাবাদে চলে যাই। সে ফিরে আসে, আবার যায়; ঐ-রকম করে দশ দিন দেরি হয়ে যায়। তার পরে আমি এসে পড়ি। আমার কাছেও নগদ টাকা ছিল না, আমার গয়নাগুলো বাঁধা দিয়ে এগার দিনের দিন দাদাকে বার করে নিয়ে আসি। তোমারও ত চার-পাঁচ হাজার টাকার গয়না আছে বৌ, মেদিনীপুরও দূর নয়। তোমাকে খবর দিতে পারলে, এ-সব কিছুই হতে পারত না। দাদা বরং দশ দিন জেলে ভোগ করলেন, কিন্তু তোমার কাছে হাত পাতলেন না। আর তোমার

তাঁর কাছে গিয়ে কি হবে? অনেক সুখই ত তাঁকে তুমি দিলে, এবার মুক্তি দাও—তিনিও বাঁচুন, তুমিও বাঁচো।

ইন্দু একমুহূর্ত মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর একে একে গায়ের সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়া, বিমলার কাছে ধরিয়া দিয়া বলিল, এই নিয়ে তোমার নিজের জিনিস উদ্ধার করে এনো ঠাকুরঝি,—আমি তাঁর কাছেই চললাম। তুমি বলচ স্থান হবে না—কিন্তু আমি বলচি, এইবারেই আমার তাঁর পাশে যথার্থ স্থান হবে। যা এতদিন আমাকে আলাদা করে রেখেছিল, এখন তাই তোমার কাছে ফেলে দিয়ে, আমি নিজের স্থান নিতে চললুম। কাল একবার যেয়ো ভাই,—গিয়ে তোমার দাদা আর বৌকে দেখে এসো,—চললুম। বলিয়া ইন্দু গাড়ির জন্য অপেক্ষা না করিয়াই বাহির হইয়া গেল।

ওরে ভোলা সঙ্গে যা, বলিয়া বিমলা চোখ মুছিয়া, পিছনে পিছনে দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল।